অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ■ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

২৬শে মার্চ
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১২ চৈত্র ১৪৩০
২৬ মার্চ ২০২৪

বাণী

আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ নয়মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সমর্থক, বিদেশি বন্ধু এবং সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু, কর্ণফুলী টানেল ও মেট্রোরেল দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ও ভূ-রাজনৈতিক সংকটের প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগবর্ধক নানামুখী প্রকল্প, কর্মসৃষ্টি এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ রেমিট্যান্স অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সংকট মোকাবিলায় আমাদেরকেও সম্পদ ব্যবহারে হতে হবে মিতব্যয়ী এবং ভোগবিলাসে কৃচ্ছ্রতা অনুসরণ করতে হবে। আমি আশা করি, বিগত বছরসমূহে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থসামাজিক সূচকসমূহে সরকারের অভূতপূর্ব অর্জনের ওপর ভিত্তি করে আমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' -বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়। বাংলাদেশ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখেছে, বাংলার মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। আমরা বিশ্বে আর কোনো যুদ্ধ চাই না। ফিলিস্তিনসহ বিশ্বের যে সকল দেশে যুদ্ধ ও গণহত্যা চলছে আমরা তার নিন্দা জানাই। আমি জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান ও ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য দেশে যুদ্ধ বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানাই।

স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা আমাদের পবিত্র কর্তব্য। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির চাকাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। কোনো কিছুই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হলেন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি বরং বাঙালির চিত্তাকাশে আরও উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুধাবন করতে হবে, আমরা যে পথ দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি তা তৈরি করে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভবিষ্যতেও তাঁর দেখানো পথই হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সোপান।

দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে - মহান স্বাধীনতা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১২ চৈত্র ১৪৩০
২৬ মার্চ ২০২৪

বাণী

আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে দেশে এবং প্রবাসে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন, সংস্থা, ব্যক্তি এবং বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিনে দিনে পাকিস্তানিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেখ মুজিব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালিদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অটল ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ, যে সংগঠন দুটির সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন জয়লাভ, ১৯৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬-এর ছয় দফা, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন-সংগ্রামে এ সংগঠন দুটির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। গণরোষের মুখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন, 'আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।'

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা শুরু করে। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। ২৩ মার্চ সারা দেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা 'অপারেশন সার্চ লাইট' এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে পাক সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বাঙালির জনককে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জাতির পিতার ডাকে বাংলার মুক্তিপাগল জনতা 'জয় বাংলা' স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৭ এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর মিত্র শক্তির সহায়তায় ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূন্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন করেন, এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। স্বাধীনতা অর্জনের ৯ মাসের মধ্যেই একটি সংবিধান উপহার দেন। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১২৩টি দেশের স্বীকৃতি এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বঙ্গবন্ধুর আমলে আমাদের প্রবৃদ্ধি ৯ শতাংশ অতিক্রম করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে থাকে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ শাহাদাতবরণ করেন। খুনি মোশতাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে।

জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের জীবনমান পরিবর্তনে দ্রুত কাজে নেমে পড়ি। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা, আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তুহারা মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণসহ মোবাইল ফোন ও কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করি ও ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর, পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেই। আমরা শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করি। ব্যক্তি মালিকানায় টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেই। 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ' বাতিল করে জাতির পিতা হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু করি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকাল ছিল অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে অগ্রগতির পথে বাংলাদেশের আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার এক সোনালি অধ্যায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সবকটি জাতীয় নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সরকার পরিচালনা করছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এখন বাস্তবতা। আমরা ইতোমধ্যেই 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়েছি। এক দিনে ১০০ সেতু এবং ১০০ সড়ক উদ্বোধন করা হয়, যা ইতিহাসে এই প্রথম। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় নিয়ে এসেছি। আমরা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দৃষ্টিনন্দন তৃতীয় টার্মিনাল, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের মত মেগা প্রকল্পের বাস্তবায়ন আমাদের সামর্থ্যের বহিঃপ্রকাশ। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী করে প্রণয়ন করা হয়েছে 'ডেল্টা প্ল্যান-২১০০'। 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমানে ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে চলছে আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা।

জাতির পিতার খুনি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে আমরা দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানি শাসকদের দায়ের করা মামলা সংক্রান্ত ডকুমেন্টস নিয়ে 'আগরতলা কন্সপিরেসি কেইস' (৪ খণ্ড) এবং তাঁর বিরুদ্ধে ১৯৪৮ হতে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট 'সিক্রেট ডকুমেন্টস অব ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' (১৪ খণ্ড) প্রকাশিত হয়েছে। জাতির পিতার নিজের লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', 'কারাগারের রোজনামচা' এবং 'আমার দেখা নয়াচীন' প্রকাশ করেছি। আমার বিশ্বাস, এই বইগুলো পড়ে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতার দৃঢ় পদচারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের দর্শনে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের জীবনমান এবং দেশের উন্নয়নে আমরা আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। এছাড়া নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিয়ে আমরা নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছি। এসকল কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা এবং জোরালো সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

আসুন, স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের এ মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ অসাম্প্রদায়িক 'স্মার্ট সোনার বাংলা' বিনির্মাণের শপথ নেই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

চির অবিস্মরণীয় ২৬ মার্চ

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

২৬ মার্চ বিশ্বের ইতিহাসে একটি লাল আক্ষরিক দিবস। ১৯৭১ সালের সেই দিনই বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় জন্ম নেয় একটি দেশ, যেটি স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, সকল দেশের রানী। স্বাধীনতা ঘোষণা রক্ষার্থে ৩০ লক্ষাধিক শহিদের রক্ত ঝরেছিল, নির্যাতিত হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মা-বোন।

এ অঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন সকলেই জানেন যে ২৬ মার্চ একদিনে ঘটেনি। এর পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর ২১ বছর সংগ্রাম এবং কৌশল নিয়ে এগুনোর ইতিহাস।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধের দামামা বাজার সাথে সাথে বৃটিশ রাজ ভারতবর্ষের মানুষদের সমর্থন চাইলে, বিনিময়ে ভারতবাসী স্বাধীনতার দাবি জোড়ালো করেন, 'বৃটিশ হাটাও' আন্দোলন আরো বেগবান হয়। বৃটিশরা বিদায়ের অঙ্গীকার না করলেও তাদের চিন্তা চেতনায় পরিবর্তন দেখা যায়। ধরে নেয়া হচ্ছিল যুদ্ধ শেষে ইংরেজ বিদায় নেবে। সেই প্রেক্ষাপটেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতাদের সভায় শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক উত্থাপিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়, যাতে উল্লেখ ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলোতে সৃষ্টি হবে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ। সে অর্থে পূর্ব বাংলা একটি আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হওয়ারই কথা ছিল। ৪০ থেকে ৪৬ সাল পর্যন্ত পানি বহুদূর গড়ায়। মোহাম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ লাহোর প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য পরিবর্তন করে পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিমের চারটি প্রদেশ নিয়ে একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্রে সফল হন, ফলে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র না হয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলি জিন্না উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে মর্মে ঘোষণা দিলে পূর্ব বাংলার জনগণের বুঝতে বাকি থাকেনি যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা তারা প্রতারিত হয়েছেন। তখন থেকেই পূর্ব বাংলার তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতে শুরু করেন, যে কথা গত ৮ মার্চ স্বয়ং বঙ্গবন্ধু কন্যা, জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই উল্লেখ করেছেন। ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপনকালে বঙ্গবন্ধুও বলেছিলেন "স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ৯ মাসই হয় নাই; স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছে ১৯৪৭ সনের পর থেকে।" প্রথম দিকে বঙ্গবন্ধু অনেকটা 'একলা চলো রে' নীতি অনুসরণ করছিলেন। তার স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হলেও অসম্ভব নয়, এর পেছনে জনসমর্থন রয়েছে, তা বুঝতে পেরে কালের চক্রে বহু নেতা বঙ্গবন্ধুর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। কণ্টকাপূর্ণ এ পথ ধরে এগুতে বঙ্গবন্ধুকে বহু বছর কারাবাস করতে হয়েছে। ৬০-এর দশকে তার পরিকল্পিত স্বায়ত্তশাসনের দাবি অধিক শক্তিশালী হলে পূর্ব বাংলার জনগণ তাকে একচ্ছত্র নেতা হিসেবে গ্রহণ করে স্বায়ত্তশাসন অর্জনে তার দাবির প্রতি নিরঙ্কুশ সমর্থন প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এক সম্মেলনে ৬ দফা সংবলিত দাবি পেশ করলে গোটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক চিত্রপটে পরিবর্তন ঘটে। ৬ দফায় পূর্ব বাংলার বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল, যাতে প্রতিফলিত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর অতুলনীয় মেধা, দূরদৃষ্টি ও দৃঢ়তার চিত্র। বিশ্বব্যাপী প্রমাণিত হয়েছিল তার প্রজ্ঞার পরিধি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ৬ দফার দাবিকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার দাবি বলে উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যায়িত করেন, নির্যাতনের সকল পন্থা অবলম্বন করেন, বহুবার জেলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষের এই ত্রাণকর্তা জেল-জুলুম উপেক্ষা করে বাঙালিদের মুক্তির দাবি চালিয়ে গিয়েছিলেন। ৬ দফা ঘোষণার পূর্বেও তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের বলেছেন যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে থাকা সম্ভব নয়। ১৯৬১ সালের শেষের দিকে তিনি এক নেতাকে বলেছিলেন, "(পাকিস্তানিদের) সাথে আমাদের থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।" (সূত্র : অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন রচিত 'বঙ্গবন্ধুর জীবন')। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান ৬ দফার সমর্থকদের কঠোর হুশিয়ারি দিয়েছিলেন। এটি গণমুক্তি সনদের রূপ নিয়ে বাঙালিদের 'ম্যাগনাকার্টায়' পরিণত হয়েছিল। ৬ দফাই বাংলাদেশকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে, এটি বুঝতে পেরে পাকিস্তানিরা শুরুতেই প্রতিরোধে নেমেছিলেন, কঠোর দমন নীতির আশ্রয় নিয়ে।

বঙ্গবন্ধুর পেছনে জনগণের একত্রিত হওয়ার মূল কারণ ছিল এই যে এতো বিচক্ষণতা ও নিঃস্বার্থভাবে পূর্ব বাংলার মানুষের অধিকার নিয়ে অন্য কেউ কথা বলেননি। ১৯৪৮ সাল থেকে শুধু বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতির উপরই পাকিস্তানিরা আক্রমণ চালায়নি, অর্থনৈতিকভাবেও পূর্ব বাংলাকে পঙ্গু করেছে। তখন পূর্ব বাংলার পাটই ছিল পাকিস্তানের অর্থনীতির ভিত্তি, বিশেষ করে কোরিয়া যুদ্ধের সময়। অথচ পাট রপ্তানি করে উপার্জিত অর্থের সিংহভাগ খরচ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে একাধিক বাঁধ নির্মাণে, একের পর এক শহর তৈরিতে, নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ইসলামাবাদকে ঢেলে সাজাতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। বহু শিল্প কারখানা গড়া হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, সব ব্যাংকের মালিক ছিলেন তারা। সেখানকার কয়েকজন শিল্পপতি গোটা দেশের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে উপনিবেশিক কায়দায় পূর্ব বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শ্রম ব্যবহার করতেন। সামরিক বাহিনীতে দেশের বাজেটের মোটা অংশ ব্যয় হলেও সেখানে বাঙালিদের অবস্থান ছিল নগন্য। খেলাধুলায়ও বাঙালিদের স্থান দেয়া হতো না। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির পর উপনিবেশিক চিত্র আরো প্রচ্ছন্ন হয়, কেননা সামরিক বাহিনী মানে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে পূর্ব বাংলায় প্রলয়ংকরি ঘূর্ণিঝড়ের পর পাকিস্তানিদের শোষক চরিত্র বেশি করে ফুটে উঠে। সেই ঝড় শোকাবহ ঘটনাবলির জন্ম দিলেও, পাকিস্তান সরকারের নিষ্ক্রিয়তা গোটা বিশ্বে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। এমনকি হেনরি কিসিঞ্জারও তার পুস্তকে সেটিকে শতাব্দীর ভয়াবহতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে উল্লেখ করেছেন। (সূত্র : কিসিঞ্জার লিখিত হোয়াইট হাউজ ইয়ার্স)। খাদ্য, ওষুধ, পরিধেয় কাপড় কিছুই প্রদান করা হয়নি বলে বিদেশি সংবাদ মাধ্যমসমূহেও উল্লেখ করা হয়। সে অবস্থায় দেশে সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর দল ভূমিধস বিজয় অর্জন করে। বঙ্গবন্ধু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এ বিজয়কে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে গণভোটের রায় বলে আখ্যায়িত করেন। (সূত্র : ড. মুনতাসীর মামুনের উল্লিখিত পুস্তক)। তারপরও সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টো সর্বাধিক ভোট পাওয়া বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা তুলে দিতে নারাজ হন। সে অবস্থায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে জনগণকে দ্রুত স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হতে বলেন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে কয়েক

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

বঙ্গবন্ধুর অন্তহীন শিক্ষাচিন্তা

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাচিন্তার কেন্দ্রে ছিল মানুষ। মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষায় দীক্ষিত হওয়ার কথাই বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন জীবনভর। মানবচেতনার অনুরাগে সিক্ত ও সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন যে, মানুষকে ভালোবাসার মাঝেই পৃথিবীর সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় শৈল্পিক রূপ বিদ্যমান।

বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে জাতির উদ্দেশে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণে বঙ্গবন্ধু ছাত্র-ছাত্রীদের বলেন, "আমার ছাত্র ভাইয়েরা যাহারা মুক্তিসংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি আমি আহ্বান জানাইতেছি যে, তাহারা যেন আমাদের বিপ্লবের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাহাদের কাজ করিয়া যাইতে থাকে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা তৈরির নির্দেশসহ আমি একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করিতে চলিয়াছি।" (ইত্তেফাক, ২৭ মার্চ, ১৯৭২)

১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই গঠিত ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রণীত প্রথম পাঁচ অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাচিন্তার একটি বর্ণনা আমরা লক্ষ্য করি। শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বঙ্গবন্ধু তাঁর চিন্তাভাবনা ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা ও অন্যান্য কমিশন সদস্যদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করেছিলেন ও আমাদের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত জাতীয় মূলনীতি চতুষ্টয়ের আলোকে একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

কমিশন প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ের ১.৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "দীর্ঘদিনের শোষণ জর্জরিত সমাজে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তার বাহন হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টিরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।" (কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, পৃঃ ৪)

দেশে বিদেশে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর সকল বক্তৃতায় আমরা সরাসরি শিক্ষার উপাদান খুঁজে পাই অথবা পুরো বক্তৃতাই হয়ে উঠে আমাদের কাছে জরুরি পাঠ্য বিষয়। বঙ্গবন্ধুর সকল বক্তৃতা বা ভাষণই প্রকৃতপক্ষে নবীন প্রজন্মের জন্য শিক্ষণীয় উপকরণ।

শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর নিরন্তর চিন্তাপ্রবাহ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের একশ' চৌদ্দ বৎসর পূর্বে রচিত পঙক্তি "জয়ধ্বনি শুনিয়ে যাব/ এ মোর নিবেদন"। জয় বাংলা ধ্বনি উচ্চারণ করে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যেমন বিজয় অর্জনে নেতৃত্ব দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু ঠিক তেমনি জাতিকে সুশিক্ষিত ও সুসংস্কৃতবান করার লক্ষ্যে তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে বিভিন্নভাবে তাঁর চিন্তাভাবনার কথা বলে গেছেন, দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন ও শিক্ষার ভিত রচনার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

বাংলার আকাশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ন্যায় উজ্জ্বল, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান ও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটেছিল বিধায় আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম জাতিরাষ্ট্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাচিন্তার যে বর্ণনা আমরা ইতিহাসে পাই তা একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার নিরিখে বলা যায় তা অসাধারণ ভবিষ্যৎদর্শনের রূপরেখা। বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সংগ্রাম মূলত শিক্ষার আন্দোলন।

পাকিস্তান আমলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের প্রক্কালে ২৮ শে অক্টেবর ১৯৭০ তারিখে বেতার ও টেলিভিশনে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা থেকে বুঝা যায় শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধু কত গভীরভাবে চিন্তা করতেন। সেদিনের সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে একটি দেশের জন্য উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারে না। ১৯৪৭ সালের পর বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাবার পরিসংখ্যান একটা ভয়াবহ সত্য। আমাদের জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জন অক্ষর জ্ঞানশূন্যহীন। প্রতিবছর ১০ লাখেরও অধিক নিরক্ষর লোক বাড়ছে। জাতির অর্ধেকের বেশি শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। শতকরা মাত্র ১৮ জন বালক ও ৬ জন বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করছে। জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কমপক্ষে ৪ ভাগ সম্পদ শিক্ষাখাতে ব্যয় হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। কলেজ ও স্কুল, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করতে হবে। নিরক্ষরতা অবশ্যই দূর করতে হবে।"

"পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক, অবৈতানিক প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য একটিস ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রাম চালু করতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার সকল শ্রেণির জন্য খোলা রাখতে হবে। দ্রুত মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সহ নয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অভিশাপ না হয়ে দাঁড়ায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যাতে বাংলা ও উর্দু ইংরেজির স্থান দখল করতে পারে সে ব্যাপারে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার বিকাশ ও উন্নয়নের ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে।" (অধুনালুপ্ত আজাদ, ২৯ অক্টোবর, ১৯৭০)। এখানে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বছর ১৯৪৭ সালের পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কথা উল্লেখ করার সময় এই জনপদকে বাংলাদেশ বলে অভিহিত করেন ও ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেছিলেন যে "এখন হইতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশটির নাম হইবে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধুমাত্র বাংলাদেশ।" (ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৯)।

১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু সারা পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন কিন্তু ইয়াহিয়া-ভুট্টোর ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ও ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ২৫ শে মার্চ ১৯৭১ মধ্যরাতে যখন গণহত্যা শুরু করে তখন বঙ্গবন্ধু ২৬ শে মার্চ ১৯৭১ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা বিজয় অর্জন করি ও ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

দেশে ফিরে ১২ই জানুয়ারি প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধু সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন ও ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে অঙ্গীকার করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

"রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতিতে গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতানিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য (খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"

বঙ্গবন্ধু তরুণ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে পাকিস্তানের প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে গণচীন সফর করেন। পূর্ব বাংলার শ্রমমন্ত্রীর কার্যকালেও পাকিস্তান সংসদীয় দলের নেতা হিসেবে ১৯৫৭ সালে তিনি পুনরায় চীন সফর করেন। ১৯৪৯ সালে চীনা বিপ্লবের এত অল্প সময়ের মাঝে চীনের অভূতপূর্ব উন্নয়নে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন।

১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের পর কারাগারে বসে তিনি যে অভিজ্ঞতার কথা লিখেন তাতে শিক্ষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। 'আমার দেখা নয়া চীন' গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলাম। বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। আমাদের দেশের মতো কেরানি পয়দা করার শিক্ষাব্যবস্থা আর নাই। কৃষি, শিক্ষা, শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে আমার সাথে আলাপ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিঃ হালিমের। তাঁর একটি চীনা নামও আছে, সেটা আমার মনে নাই। ভদ্রলোক ইংরেজি জানেন। তাঁর সাথে প্রায় এক ঘন্টা আলাপ হলো। তিনি আমাকে বললেন, বাধ্যতামূলক কিছু শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হয়। সরকার তাদের যাবতীয় খরচ বহন করে। কৃষকদের জন্য কৃষি স্কুল করা হয়েছে। প্রত্যেক শিল্পকেন্দ্রের কাছে স্কুল আছে। বড়োদের শিক্ষা দেওয়া হয় কাজের ফাঁকে, আর তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত আছে। সকল দিকে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, মাত্র চার বৎসরে তারা শতকরা ৩০ জন লোককে লেখাপড়া শিখিয়ে ফেলেছে। গর্ব করে আমাকে আরও বলল, "১০ বৎসর পরে যদি চীনে আসেন তবে দেখবেন একটি অশিক্ষিত লোকও নাই।" চীনে এখন স্বাক্ষরতার হার ৯৯.৮৩ শতাংশ এখন প্রতি বৎসর স্বাক্ষরতা ০.০১৮ শতাংশ হারে বেড়ে চলেছে।

বঙ্গবন্ধু আরও লিখেছেন, "একটি বিষয় দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। এক এক দেশে এক এক প্রকারের 'স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শ্রেণি' (প্রিভিলেজড ক্লাস) আছে যেমন আমাদের দেশে (অর্থাৎ পাকিস্তানে) অর্থশালী জমিদার 'প্রিভিলেজড ক্লাস', অন্য দেশে শিল্পপতিরা 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। কিন্তু নতুন চীনে দেখলাম শিশুরাই 'প্রিভিলেজড ক্লাস'। এই প্রিভিলেজড ক্লাসটা সরকারের নানা সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে। নয়াচীন সরকারের হুকুম, প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে স্কুলে দিতে হবে, পোশাক ঠিক করা আছে, সেইভাবে পোশাক দিতে হবে। যাদের দেবার ক্ষমতা নাই তাদের সরকারকে জানাতে হবে। সরকার তাদের সাহায্য করবে। নতুন মানুষের একটা জাত গড়ে তুলেছে নয়াচীন। ১৫/২০ বৎসর পরে এরা যখন লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে দেশের জন্য কাজ করবে তখন ভেবে দেখুন, নয়াচীন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।" (আমার দেখা নয়াচীন, পৃঃ ৫৯-৬০)। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বর্তমান বাস্তবতায় উপলব্ধি করছি যা বঙ্গবন্ধু তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গ্রন্থের বিভিন্ন অংশে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৯৫৭ সালে চীন ভ্রমণের পর বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "চীনের দ্রুত অগ্রগতিতে এশীয় দেশসমূহ গর্বানুভব করিতে পারে।" (অধুনালুপ্ত আজাদ, ১৫ জুলাই, ১৯৫৭)।

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে দেশের প্রায় ৩৭ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। সে সময় খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দারুণ-সংকট থাকার পরও তিনি শিশুদের শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের প্রথম জাতীয় কংগ্রেসে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু দেশের কল্যাণে যুবসমাজকে আগাইয়া আসার আহ্বান জানাইয়া বলেন, "ওয়াদা করো, দুনীতির বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কেন তোরা থাকতে দেশে ডাকাতি-রাহাজানি হয়? আমি যেখানে আছি, সেখানে কেন তোরা উহা বন্ধ করতে পারবিনা? কিন্তু দোহাই তোদের 'ফাউল গেম' করবিনা।"

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, "আজিকার যুবকরাই আগামীকাল দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবে। তাই, এ ব্যাপারে তাহাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। তাহাদের মত ও পথ ঠিক করা এবং কথা ও কাজে সঙ্গতি থাকিতে হইবে।" (ইত্তেফাক, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪)। আত্মসংযম, সাহসিকতাসহ, আত্মসমালোচনা ও আত্মত্যাগের আহ্বান জানাইয়া বঙ্গবন্ধু বলেন যে, "আত্মশুদ্ধ যুবশক্তির উন্মেষ দেখতে চাই বাংলাদেশে।"

এ প্রসঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের মাতা কবি কুসুমকুমারী দাশের (১৮৭৫-১৯৪৮) ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'কবিতা মুকুল' এ ছাপা 'আদর্শ ছেলে' কবিতার চারটি পঙক্তি উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে যুবসমাজের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আকাঙ্ক্ষার সমমুখী ভাবনা পরিলক্ষিত হয়:

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে?
মুখে হাসি বুকে বল, তেজে ভরা মন
'মানুষ হইতে হবে', এই যার পণ।"

কবিতাটিতে আরও দু'টো পঙক্তি, 'মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন' এবং 'তোমরা 'মানুষ' হলে দেশের কল্যাণ' প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আত্মশুদ্ধ মানুষ হওয়ার আহ্বান জানায় যা বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাদর্শনেরই প্রত্যক্ষ রূপ। [illegible] তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে [illegible] শপথ গ্রহণ করেছিলেন [illegible] দিব্যদৃষ্টিতে [illegible] কঠিন [illegible] উচ্চে [illegible] মর্যাদায় [illegible] প্রতিশ্রুতি [illegible] করিতে হইবে।" তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স বাতিল করার জোর দাবি জানান। (ইত্তেফাক, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭০)

বাংলাদেশে মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সাড়ে সাত কোটি মানুষের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল একান্তই অপ্রতুল। বঙ্গবন্ধু দেশের উচ্চশিক্ষা নিয়ে সর্বদাই চিন্তা করতেন বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন ছিল বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে।

দেশের প্রথম বিজয় দিবসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন যে বাংলাদেশের সংবিধান আজ অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ থেকে কার্যকর করা হলো। এ ঐতিহাসিক দিনে তিনি [illegible] কালাকানুন আজ থেকে (১৬/১২/১৯৭২) বাতিল হয়ে গেল। জনসভায় ভাষণে বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, "স্বাধীনতার পর বিশ্বের কোনো দেশে এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবিধান রচনা হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার মাত্র ১০ মাসের মাথায় সংবিধান প্রণয়ন করে এক নয়া ইতিহাস রচনা করল।"

পরবর্তীতে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রশাসন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার সকল স্বাধীনতা প্রদান করেন। একইভাবে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এই গণতান্ত্রিক আদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

চির অবিস্মরণীয় ২৬ মার্চ

লক্ষ বাঙালি লাঠি-সোঠা নিয়ে জমায়েত হন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনতে। জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু ১৮ মিনিটব্যাপী অলিখিত ভাষণ দেন, যার মূল কথা ছিল "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" বলেছিলেন "রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।" তার বাণী ঝড়ো হাওয়ার মতো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের প্রভাবশালী পত্র-পত্রিকা বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ বলে উল্লেখ করে, বঙ্গবন্ধুকে "রাজনীতির কবি" বলে আখ্যায়িত করে লিখেছিল যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি কথায় ছিল গভীর দর্শন। বলা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিক অর্থে স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও কিছু বাকিও রাখেননি। লেখা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু প্রকারান্তরে স্বাধীনতার কথাই বলেছিলেন। ৭ মার্চের ভাষণের পর অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিলেন। বিদেশে অবস্থানরত বাঙালিরাও আন্দোলনে নেমে পড়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু কেন সেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি, সেটি অনুধাবন করা কঠিন নয়। ভাষণকালে আকাশে উড়ছিল সামরিক হেলিকপ্টার। অস্ত্রসহ ময়দান ঘিরে রেখেছিল শত শত পাকিস্তানি সেনা। জানা গিয়েছিল বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই পাকিস্তানি সৈন্যরা উপস্থিত সবাইকে হত্যা করে আরো একটি 'জালিয়ানওয়ালা বাগ' সৃষ্টি করবে। নেতা চাননি লক্ষ লক্ষ বাঙালির রক্তে রেসকোর্স রঞ্জিত হোক। তবে কৌশলে স্বাধীনতার কথা বলে পূর্ব বাংলার জনগণকে শারীরিক ও মানসিকভাবে তৈরি করতে ভুলেননি। তার ভাষণ যে দর্শন শাস্ত্রে এক নতুন সংযোজন, তা প্রমাণিত হয় ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর, যেদিন জাতিসংঘ বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্যতম অংশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। তার সেই ভাষণ ছিল পৃথিবীর অন্যান্য মনীষীদের ভাষণ থেকে আলাদা, ছিল অতুলনীয়।

বঙ্গবন্ধুর আকাশচুম্বি জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল, ১৯৬৯ সালে ২২ ফেব্রুয়ারি। ১৯৬৮ সালে আইয়ুব খান 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করেছিলেন অবিসংবাদিত এই নেতাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে হত্যার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাংলার মানুষ যে বঙ্গবন্ধুর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সে কথা উপলব্ধি করতে না পারাটা ছিল আইয়ুব খানের সবচেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা। মামলার শুরু থেকেই জনমনে ক্ষোভ জমতে থাকে। ১৯৬৯-এর ১৬ ফেব্রুয়ারি লক্ষ জনতা মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারকের বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দিলে বিচারক এ এস রহমান পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়েছিলেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান আগরতলা মামলা তুলে নিয়ে বঙ্গবন্ধুসহ সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরদিন রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে যে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর সংবর্ধনা শুধু সেটির সাথেই তুলনাযোগ্য। সেই অনুষ্ঠানেই বাঙালিদের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে পূর্ব বাংলার মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, যেটি চূড়ান্তভাবে ঘটেছিল ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ।

বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আলোচনার ছুতো দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আগমন করেছিলেন চুপিসারে বাংলাদেশে গণহত্যার নীলনকশা তৈরি করতে। তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, ছাত্র-জনতা মিছিলের পর মিছিল বের করে জনগণকে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে বলছিলেন। ইয়াহিয়া গণহত্যার ছক তৈরির জন্য পূর্ব বাংলায় নিযুক্ত সামরিক কর্মকর্তা (কসাই) টিক্কা খান, রাও ফরমান আলি প্রমুখের সাথে গোপনে বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা তৈরি করছিলেন। জেনারেল মিট্টা খান নামক এক সামরিক কর্তাকে করাচি থেকে ঢাকায় পাঠিয়েছিলেন। [illegible] (সূত্র: মিট্টা খান লিখিত 'Unlikely Beginning : A Soldiers Life', এবং ২০০৯ সালের ২ আগস্ট প্রকাশিত পাকিস্তানের ডন পত্রিকা)।

পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলায় সেনা প্রেরণ চলছিল অবিরামভাবে। মার্চে পাকিস্তান আন্তর্জাতিক এয়ার লাইন তার বিদেশি রুটগুলো বাতিল করে শুধু পূর্ব বাংলায় সেনা বহনের কাজে ব্যস্ত ছিল। সমস্ত বিদেশি সাংবাদিকদের পূর্ব বাংলা থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও অনেকে কৌশলে থেকে গিয়েছিলেন। এশিয়া টাইমস পত্রিকার খবর অনুযায়ী ইয়াহিয়া সামরিক অধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করতে। ইয়াহিয়ার ইঙ্গিত পেয়ে ২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন, ত্রিপক্ষীয় আলোচনার ধুয়া তুলে। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে বঙ্গবন্ধু তার বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ২৫ মার্চ বিকেলে ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগের পূর্বে টিক্কা খান গংদের নির্দেশ দিয়েছিলেন 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে রাতে তা বাস্তবায়নের। ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করেছেন, ইয়াহিয়া টিক্কা খানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন বাংলাদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই। টিক্কা খানও বলেছিলেন যে তিনি বাংলাদেশের মানুষ চান না, শুধু ভূমি চান। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানের শপথ পরিচালনা করতে অস্বীকার করেছিলেন।

২৫ তারিখ দিবাগত রাতেই যে পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণে নেমে পড়বে, বঙ্গবন্ধু তা জানতেন আর তাই তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা এবং তা সম্প্রচারের জন্য সমস্ত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তিনি পালিয়ে গেলে পাকিস্তানি হার্মাদরা গোটা বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করবে।

২৫ তারিখ দিবাগত রাতে, রাত ১২টার কিছু পরে তাদের কারিগরি সহায়তায় স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল, ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে। বাংলাদেশে সংরক্ষিত তথ্য অনুযায়ী ঘোষণাটির প্রচার বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা উল্লেখ করেছে। বাংলাদেশের দায়িত্ব পালনে পাঠানো পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা সিদ্দিক সালিক তার বইতে উল্লেখ করেছেন, "প্রথম গুলিটি ছোড়ার মুহূর্তেই পাকিস্তান রেডিওর ওয়েভের কাছাকাছি একটি ওয়েভ থেকে ক্ষীণ স্বরে শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। মনে হচ্ছিল বাণীটি আগেই রেকর্ড করে রাখা হয়েছিল, যাতে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা দেন।" সিদ্দিক সালিক আরো লিখেছেন, "ঘোষণায় গুরুত্বের সাথে বলা হয় এটিই হয়তো আমার শেষ বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।" (সূত্র: সিদ্দিক সালিক লিখিত বই 'উইটনেস টু সারেন্ডার')

যুক্তরাজ্যের সৈনিক টেলিগ্রাফ পত্রিকার এশিয়া প্রতিনিধি ডেভিড লোশাক লিখেছিলেন, "শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর খুব ক্ষীণ হয়ে কোনো যাচ্ছিল।" ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ হ্যান্ডবিল আকারে ইংরেজি ও বাংলায় ছাপিয়ে চট্টগ্রামে বিলি করেন আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরী। ঘোষণাটি চট্টগ্রামস্থ ইপিআর সদর দপ্তরে ও ওয়্যারলেস মারফত পাঠানোর ব্যবস্থা করায় বহু লোক এবং বিদেশি সংবাদকিগণ তা জানতে পান। ২৬ তারিখের বেলা ২টা ১০ মিনিট এবং ২টা ৩০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান কালুরঘাটস্থ বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণটি পাঠ করেন। পরে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাশেম সন্দ্বীপ, সুলতানুল আলম, আব্দুল্লাহ আল ফারুক, কবি আব্দুস সালাম, মাহমুদ হাসান প্রমুখগণ ও কালুরঘাটস্থ বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণটি পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ইহাই হয়তো আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছো, যাহার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"

মার্চেই বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য অস্ত্র বোঝাই করে 'সোয়াত' নামক একটি জাহাজ চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিল পাকিস্তানিরা। জাহাজটি থেকে অস্ত্র খালাসের দায়িত্ব দেয়া হয় চট্টগ্রামে কর্মরত মেজর জিয়াউর রহমানকে। তিনি পাকিস্তানের প্রতি অনুগত বাঙালি কর্মকর্তা, সম্ভবত এটা জেনে তাকেই সে দায়িত্ব দেয়া হয়, যখন গোটা দেশে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন, যখন সকলেই নিশ্চিত ছিলেন যে কোনো মুহূর্তে পাকিস্তানি বর্বররা বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এ সকল জানা সত্ত্বেও বাঙালি কর্মকর্তা মেজর জিয়াউর রহমান বাধ্য অফিসারের মতো তার উপরওয়ালাদের নির্দেশ পালন করে ২৫ তারিখ দিবাগত রাতে, অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার পরে, ছুটে চলেছিলেন সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানি মারণাস্ত্র খালাস করতে, যে কথা সে সময়ের অনেক বাঙালি বীর মুক্তিযোদ্ধা, মেজর রফিক, বীর উত্তম, তার লিখা পুস্তকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। জানা গেছে সোয়াত জাহাজ অভিমুখে যাত্রাকালে জিয়াউর রহমান সড়ক অবরোধকারী জনতাকে বাধা অপসারণ করে কয়েকজনকে হত্যা করেছিলেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম, ১৯৮১ সালে কোলকাতা অবস্থানকালে 'স্বাধীনতা ৭১' নামে যে বইটি লিখেছেন, তাতে সোয়াত জাহাজ থেকে পাকিস্তানি অস্ত্র খালাসের ব্যাপারে মেজর জিয়ার সিদ্ধান্তের কথা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছেন বইটির ৩৪-৩৬ পৃষ্ঠায়, যার কিছু অংশ নিম্নে মুদ্রিত হলো,

"'৭০-এর ডিসেম্বরে সাধারণ নির্বাচনের পর, পাকিস্তানের ইতিহাসে যখন এক চরম রাজনৈতিক উত্থান পতনের সূচনা হয়, তখন পর্যন্ত জিয়াউর রহমান তার রেজিমেন্ট গঠনের কাজে পুরোপুরিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। '৭১-এর মার্চের ১৫-১৬ তারিখে, জিয়াউর রহমানের ব্যাটেলিয়নের দুটি কোম্পানি চট্টগ্রাম জেটি ও আরেকটি কোম্পানিকে কালুরঘাট সেতু পাহারার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। এই সময় কাজের সুবিধার জন্য জিয়াউর রহমান কালুরঘাটের কাছে বিএন কোয়ার্টার ও কন্ট্রোল রুম বসান।

২৪ শে মার্চ পর্যন্ত জিয়াউর রহমান নিরুপদ্রবেই কাটান। কিন্তু ২৫ শে মার্চের মধ্য রাতে ব্যাটেলিয়নের বেশ কয়েকজন সদস্য জিয়াউর রহমানের কাছে ছুটে আসেন এবং তাঁকে ও জীবিতম খবর পৌঁছে দিতে থাকেন। এ সময়কার রাজনৈতিক উত্তেজনা ও সামরিক বিভাগের আভ্যন্তরীণ সন্দেহ, অবিশ্বাস, অসদ্ব্যবহার ও আক্রমণের প্রেক্ষিতে তাদের করণীয় কি, তা জানাতে জিয়াকে বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। ২৫ শে মার্চের রাত প্রচণ্ড উত্তেজনা ও উদ্বেগের মধ্যে কাটে। ২৬ শে মার্চ সকালে ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার থেকে তাকে ডেকে পাঠানো হলো। নানা কিছু ভেবে জিয়া ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে যাওয়া স্থির করেন। কিন্তু তার কিছু সহকর্মী তাকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে যেতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

এত অনুরোধ ও নিষেধ উপেক্ষা করেও তিনি একখানা জীপে ই.বি.আর.সি ক্যান্টনমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তার বেরিয়ে যাওয়ার সময় ৮ম রেজিমেন্টের কোয়ার্টার মাস্টার ক্যাপ্টেন অলি আহমদ অফিসে ছিলেন না। তিনি শিবিরে এসেই কমান্ডার কোথায় জানতে চান। কমান্ডার ই.পি.আর.সি হেডকোয়ার্টারের দিকে গেছেন বলে সৈনিকরা তাকে জানালে, ক্যাপ্টেন অলি উদ্বেগের মধ্যে একটা মিলিটারি মোটর সাইকেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ক্যান্টনমেন্টের দিকে ছোটেন। টাইগার পাসের কাছে তিনি জিয়ার জীপের গতিরোধ করে দাঁড়ান। জিয়ার গাড়ির সামনে অলি তার মোটর সাইকেলটি ফেলে দিয়ে চালকের আসনে বসা জিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, 'স্যার, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' জিয়া স্বাভাবিকভাবেই বললেন, 'ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছি। ব্রিগেডিয়ার ডেকে পাঠিয়েছেন।' অলি চিৎকার করে উঠেন, 'আপনি এখনও ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছেন? গেলেই আপনাকে গুলি করবে। আপনি জানেন কি, গতকাল রাতে বাঙালি রিক্রুটদের গুলি করে হত্যা করেছে; কুমিল্লা বেঙ্গল রেজিমেন্টে লাইন ঘেরাও করা হয়েছে। এই সময় জানার পরও কোনো সাহসে আপনি ক্যান্টনমেন্টে যাচ্ছেন?'

'কি বলছ? ক্যান্টনমেন্টে না গেলে যে কোর্ট মার্শাল হবে।' এবার ক্যাপ্টেন অলি আহমেদ আরও উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন নাকি? কিসের কোর্ট মার্শাল? গুলি, গুলি করে মারবে ওরা। আপনি কিছুতেই ক্যান্টনমেন্টে যেতে পারবেন না,' বলেই ক্যাপ্টেন অলি তার রিভলভার উঁচিয়ে বলেন, 'আপনাকে এখনও কমান্ডার হিসেবে মানি। কিন্তু আপনি যদি ক্যান্টনমেন্টে যেতে চান তাহলে আমিই আপনাকে গুলি করব। পশ্চিমাদের হাতে গুলি খেয়ে মরার চেয়ে বাঙালির হাতে গুলি খেয়ে মরে অন্তত শান্তি পাবেন।' অতিশয় আতঙ্কিত ও উত্তেজিত ক্যাপ্টেন অলি এই কথা বলেই জীপের সামনের সিটে বসে পড়েন। এবার অনুরোধ নয়, আদেশের সুরে বললেন, 'গাড়ি ঘুরান।' মেজর জিয়া ক্যাপ্টেন অলি আহমেদের কথামত গাড়ি ঘুরিয়ে নেন। তারপর তারা শহরের মধ্যে এসে কালুরঘাট ও চট্টগ্রামের রাস্তার এক পাশে একটি গাছের নিচে বসে পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেন। এই সময় সেখানে আরও দুজন ক্যাপ্টেন ও একজন লেফটেন্যান্ট এসে উপস্থিত হন। এ খবর পেয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও গণপরিষদ সদস্য জহুর আহমদ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান ও আরও কয়েকজন এসে তাদের সমাদর করে সংগ্রাম পরিষদ অফিসে নিয়ে যান।

বাঙালি সামরিক অফিসাররা তখন সংগ্রামী বাঙালিদের কাছে মহামূল্যবান। চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র তখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সংগ্রাম পরিষদের নিয়ন্ত্রণে। ইতিমধ্যেই 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র' নামে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা বারবার প্রচার করা হচ্ছিল। জহুর আহমেদ চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী, আব্দুল হান্নান, এম এ মান্নান ও অন্যান্য বেশ কয়েকজন নেতা স্বাধীনতার পক্ষে হানাদারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সময় প্রভাবশালী নেতা এ কে খান উপলব্ধি করেন যে, একজন সামরিক অফিসারের মুখে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করা হলে সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা উদ্বুদ্ধ হবেন। "আপনাদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমি মেজর জিয়া ঘোষণা করছি" — এভাবে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা পাঠ করেন। মেজর রফিক বীর উত্তম এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জিয়া বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করার পর থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধে যোগ দেন, এ কথা জিয়াউর রহমান নিজেই স্বীকার করেছেন।

বাঙালিরা থেমে থাকেননি। অন্যদিকে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল ইতিহাসের ঘৃণ্যতম গণহত্যা। সায়মন ড্রিং, পিটার হেজেলহার্স্ট, টনি ম্যাসকেরেনহাস-এর মতো বিদেশি সাংবাদিকগণ তা প্রত্যক্ষ করে লিখেছেন যে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা শহরেই কমপক্ষে ৫০ হাজার লোককে হত্যা করেছিল। পুলিশ লাইন, ইপিআর সদর দপ্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো, ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকা মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। রাস্তায় যাকে দেখা গেছে তাকেই হত্যা করা হয়েছে। বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ড বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ২৭ মার্চ বলেছিলেন, "আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রছাত্রী হতাহত হয়েছেন। ২৫ মার্চের দিবাগত রাতে বৃটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার একটি ভয়াবহ রাত যাপন করেন। পরের দিন তিনি গুলশান থেকে শহরের দিকে আসবার চেষ্টা করে রাস্তায় অনেক মৃতদেহ দেখে ফিরে যান। তার একজন ফার্স্ট সেক্রেটারি সান্ধ্য আইন শিথিল করার পর অল্পক্ষণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেন ইকবাল হলের সিঁড়ি বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। তিনি জানতে পারেন জগন্নাথ হলের সামনের গণসমাধি খনন করে সেখানে নিহত ছাত্র-শিক্ষকদের শবদেহ ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়।" (সূত্র : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী লিখিত 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি')। ঢাকায় কর্মরত মার্কিন কনসাল জেনারেল আর্থার ব্লাড ওয়াশিংটনে পাঠানো তারবার্তায় উল্লেখ করেছিলেন যে বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা গণহত্যা চালাচ্ছে। (সূত্র : ব্লাড টেলিগ্রাম)। এমনকি হেনরি কিসিঞ্জারও পাকিস্তানিদের বর্বরতার কথা স্বীকার করে উল্লেখ করেছেন যে দিল্লীতে তাদের মর্মাহত রাষ্ট্রদূতের দাবি ছিল যুক্তরাষ্ট্র যেন হত্যাযজ্ঞের কারণে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। কিসিঞ্জার উল্লেখ করেছেন, "সামরিক নির্যাতন, যাতে হাজার হাজার বেসামরিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, সেটি সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তানই যে ছিল একমাত্র ভরসা।" (সূত্র : কিসিঞ্জার রচিত 'হোয়াইট হাউস ইয়ার্স')।

২৬ মার্চ শুরু হওয়া মুক্তিযুদ্ধের ন'মাসে ৩০ লক্ষের অধিক বাঙালিকে হত্যা করে, কয়েক লক্ষ মা-বোনকে নির্যাতন করেও পাকিস্তানিরা বাঙালিদের দমাতে পারেনি- অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে পাকিস্তানি হানাদার মুক্ত করা হয়েছিল। ২৬ মার্চ বাঙালিরা যেভাবে স্বাধীনতা পেয়েছিলেন, তা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা অর্জন থেকে আলাদা ছিল। যেখানে অন্যদের স্বাধীনতা এসেছিল চুক্তির মাধ্যমে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনায় যুদ্ধের মাধ্যমে। ২৬ মার্চ অনাদিকাল চিরভাস্বর হয়ে থাকবে, যেমনি নীল ধ্রুবতারার মতো অম্লান হয়ে থাকবেন ২৬ মার্চের ঘটনার জন্মদাতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ❑

লেখক : আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

জয় বাংলা

রবীন্দ্র গোপ

কোনো কোনো রাতে আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি
আঁধারের গভীরে হাঁটেন, হাঁটতে হাঁটতে অনেক অনেক পথ
রাক্ষসেরা থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসে,পথ রোধ করে
তিনি বলেন, জয় বাংলা বাংলার জয় হোক
ওরা ভয় পেয়ে পালাতে থাকে, পালাতে থাকে,
পালাতে পালাতে অন্ধকারের গভীরে ওদের আস্তানায় ফিরে যায়।

আমি স্বপ্নের গভীরে রজনীগন্ধার মতো
পবিত্র মুখটি আমার সামনে ফুটে উঠতে দেখি
অনেক আঁধারের গভীর থেকে ফুটে ওঠে
সূর্যের মতো আমার পিতার মুখ
আমি তখন পবিত্র স্বপ্নের মাঝে বলি জয় বাংলা
বাংলাদেশ তখন জেগে ওঠে।

লাখো মাঝি তখন বৈঠায় টান দেয়
পাল তুলে বদর বদর বলে গলুইয়ে জল ছিটায়
নৌকাগুলো তখন ছুটতে থাকে অনন্ত যাত্রায়
পদ্মা মেঘনা ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে।

অসীম অন্ধকার থেকে মুক্তির মন্ত্রটি
উচ্চারিত হয় জয়বাংলা- বাংলার জয়
পিতার পবিত্র আত্মার আশির্বাদ গোলাপের
পাপড়ির মত বর্ষিত হয় বিপুল পৃথিবীতে
মাটি সুগন্ধময় হয়ে যায়।

কোনো কোনো রাতে আমি স্বপ্ন দেখি পিতাকে
চাঁদের জোছনা গলে পরা সিঁড়ি বেয়ে তিনি নামেন
বিপর্যস্ত বাংলাকে দেখে আবার ফিরে যান
গুপ্ত ঘাতকের অদৃশ্য ছায়া ঢাকা বাঙলাকে দেখে
বড়ো কষ্ট পান তিনি।

মাঝে মাঝে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়
শহীদের রক্তে ভেজা রাজপথ আমাকে কাছে ডাকে
মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখি আমার পিতাকে।
আমি শুনতে পাই, "আর যদি একটি গুলি চলে ......
তারপর আমার বুকের ব্যাথা টা টনটন করে
তর্জনীর ট্রিগারের স্মৃতিময় দিনগুলো জেগে ওঠে।

বঙ্গবন্ধুর অন্তহীন শিক্ষাচিন্তা

একষট্টিটি মূলধারা সংবলিত আদেশটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, শিক্ষা, গবেষণা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক চর্চা, আবাসিক সুবিধা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ের যে বিশদ দিকনির্দেশনা দেয়া আছে তা বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক শিক্ষা দর্শনের প্রত্যক্ষ ফল। আদেশের পরিকাঠামো যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্রে রূপান্তরের অবারিত সুযোগ করে দিয়েছে। সে সময়ের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী যাতে কোনো আমলাতান্ত্রিক বা প্রশাসনিক জটিলতায় না পড়ে কিংবা আর্থিক সংকটের সম্মুখীন না হয় সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। ১৯৭৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আরেকটি গেজেটে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠনের আদেশ প্রকাশিত হয়।

নবগঠিত কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে শিক্ষাবিদদের বঙ্গবন্ধু নিয়োগ দেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রথম ও দ্বিতীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব নিয়োগেও বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের বেছে নিয়েছিলেন। তৃতীয় শিক্ষাসচিব হিসেবে তিনি অধ্যাপক আনিসুজ্জামানকে নিয়োগের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন কিন্তু অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বিদেশ থেকে ফিরে বঙ্গবন্ধুর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই পঁচাত্তরের অভিশপ্ত পনেরো আগস্টের প্রত্যুষে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যাকান্ডের শিকার হন।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের যে কত সম্মান করতেন, কতটা ভালোবাসতেন তা বুঝা যায় যখন ২০ শে জুলাই, ১৯৭২ তারিখে তিনি সুগন্ধা কার্যালয় থেকে ছুটে যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিসে তদানীন্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে ছাত্রদের ঘেরাও থেকে মুক্ত করতে। অফিসে বসে যখন তিনি খবর পান যে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিভুক্ত কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অটো প্রমোশনের দাবিতে উপাচার্যকে তাঁর অফিসে ঘেরাও করে রেখেছে তখনই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে যাত্রা করেন ও উপাচার্য ও অন্যান্য সিনিয়র শিক্ষকদের ঘেরাও থেকে উদ্ধার করে আবার কার্যালয়ে দ্রুত ফিরে যান।

বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে শেখ রাসেলের গৃহশিক্ষক গীতালী দাশগুপ্তা বলেছেন যে, রাসেলের লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিতে কখনো কখনো পড়ানোর কক্ষে বঙ্গবন্ধু প্রবেশ করলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি (গীতালী দাশগুপ্তা) দাঁড়িয়ে যেতেন। বঙ্গবন্ধু বারবার তাঁকে বলেছেন, তুমি রাসেলের শিক্ষক, তুমি আমারও শিক্ষক। আমি আসলে তুমি কখনো দাঁড়াবে না। এই ছিল শিক্ষকদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সম্মান। গীতালী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ফাঁকে গৃহ শিক্ষকতা করতেন এবং এক সভায় তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন যে, আমি তো পরিপূর্ণ শিক্ষকও নই, একজন ছাত্রী পড়ার খরচ মেটানোর জন্য গৃহ শিক্ষকতা করি কিন্তু আমাকেও বঙ্গবন্ধু যে সম্মান দিয়েছেন তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ প্রদানের এক মাস পর ১৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন। সেখানে তিনি বলেন, "আমাদের দেশে এমন ধরনের গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন যে শিক্ষায় সত্যিকার মানুষ গড়ার মাধ্যমে জাতিকে নতুন করে সংগঠিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে পারি।" প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন যে, একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষাব্যবস্থাই দ্রুত দেশ গড়ার কাজে সহায়ক হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব বলেন যে, "গত দু'শো বছরের ব্রিটিশ শাসন এবং পঁচিশ বছরের পাকিস্তানি শাসন এ দেশে কেরানি পয়দার শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই হয় নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থায় যদি আমূল পরিবর্তন না হয়; বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাকে যদি আমরা ভেঙ্গেচুড়ে নতুন করে ঢেলে সাজাতে না পারি তাহলে এ দেশকে সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা সম্ভব নয়।"

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, দেশের বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দেশ ও জাতির চাহিদা ও প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে কমিশন এমন একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন, যার ফলশ্রুতি হিসেবে সমাজতন্ত্র কায়েমের মাধ্যমে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করবে। এই রিপোর্ট প্রণয়ন ত্বরান্বিত করার কাজে কমিশন কোনো প্রচেষ্টারই ত্রুটি করবেন না বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। (অধুনালুপ্ত বাংলার বাণী, ১৬ মার্চ, ১৯৭৩)

শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭) ৭ই জুন, ১৯৭৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে সঠিক দিক নির্ণয়ের ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রণয়নের জন্য কমিশনের নিরলস কর্মপ্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। বঙ্গবন্ধু আরও বলেন, এই রিপোর্ট প্রণয়ন করতে গিয়ে কমিশন বিভিন্ন সময়ে যেসব অসুবিধা ও জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হন সে সম্পর্কে তিনি অবহিত রয়েছেন।

রিপোর্ট পেশ করার পর কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কুদরাত-এ-খুদা গণভবনে অপেক্ষমান সাংবাদিকদের জানান যে, রিপোর্টে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, নার্সিং, কৃষি, বাঁশ, বেত প্রভৃতি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ অনুযায়ী ১ম শ্রেণি হতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, ৯ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ৪ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে।

ডঃ খুদা আরও জানান যে, পরীক্ষায় অসদুপায় ও বিভিন্ন দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস করার বিষয়ে রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করা হয়েছে।

ওয়াকিবহাল মহল সূত্রে জানা গেছে যে, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা ৬৫ ভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য শতকরা ২০ ভাগ এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য শতকরা ১৫ ভাগ অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়েছে।

ছত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত সর্বমোট প্রায় ৪৫০ পৃষ্ঠার এই রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য ২৫০টি সুপারিশ রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, সরকার ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট এই শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। কমিশন ১৯৭৩ সালের মে মাসে অন্তবর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা, ৮ জুন, ১৯৭৪)

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর প্রজাতন্ত্রের সংবিধান কার্যকর করার দুই মাসের মধ্যে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠাসহ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রদান যে কত সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল তা আমরা আজ উপলব্ধি করি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে যে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন তার মূল কারণ ছিল যে, তিনি বিশ্বাস করতেন যে প্রজাতন্ত্রের মূল ভিত্তি হলো শিক্ষা। মানুষের মনোজাগতিক উন্নয়ন ছাড়া অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে তোলা সম্ভব নয় বলেই বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সকল বৈষম্য থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ন্যায়–'মনুষ্যত্বের বিকাশই শিক্ষার মূল লক্ষ্য' এই আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর জীবনটাই আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা ও কর্ম আমাদের নবীন ও প্রবীণ সকলের জন্য শিক্ষার অনুষঙ্গ হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু যখন ৭ই মার্চ, একাত্তরে উচ্চারণ করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" তখন আমরা উপলব্ধি করি যে [illegible] বাঙালির স্বাধীন রাষ্ট্র যেখানে মুক্ত পরিবেশে নিজ ভাষায় নিজ সংস্কৃতি অনুসরণ করার সুযোগ পাবে। বঙ্গবন্ধু একাত্তরে যেমন দেশের মুক্তির কথা বলছেন ঠিক তেমনি ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ মাতৃভাষা বাংলার মুক্তির দাবিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে প্রথম কারাবরণ করেন। বঙ্গবন্ধু ভাষার মুক্তির আন্দোলন থেকে পর্যায়ক্রমে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য যুদ্ধের ডাক দেন।

বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি পদক্ষেপেই আমরা শেখার অনুপ্রেরণা পাই। ১৯৫০ সালের ২৬ শে মে তারিখে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি তাঁর এক আত্মীয়ের নিকট যে চিঠি লিখেন তার একটি অংশ নিম্নরূপ :

"I have lost my energy but you should know, to the man who lives for an idea, for his country, for the good of humanity, life has an extensive meaning, and to that extent pain becomes less important to him. I know, world is a comedz to those that thinik, a trgedz to those who feel."

"You, also asked me to give bond. I cannot understand how you can dare to write this very word 'bond' to me. I do not know how to bow down head to any man except Allah the almighty."

"Ministers think too much of themselves but the wheel of change moves on, those who are down go up and those who are up go down. Nothing in the world that is alive remains unchanged. I am definite that in the long war between falsehood and truth, falsehood always wins the first battle but truth the last." চিঠিটি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বাজেয়াপ্ত করে। (Secret Documents Vol. 1, p. XXII-XXIII)

জনগণের কল্যাণে সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা যেমন ছাত্রজীবনেই বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন তেমনি সত্য প্রকাশে সবসময়ই তিনি ছিলেন স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়প্রত্যয়ী। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি ও মুসলিম লীগের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে লিখেছেন "যদিও কোনো দলেরই কোনো সংগঠন ছিল না, ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার উপরই সবাই নির্ভর করত। মুসলিম লীগ তো তখন শুধু কাগজপত্রে ছিল।" নিখিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠায় ছাত্র হিসেবে তিনি যে অনবদ্য ভূমিকা রেখেছেন তার বিশদ ঘটনা পাই বঙ্গবন্ধুর নিজ লেখা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থের বহু স্থানে।

বঙ্গবন্ধু যে গরিব মানুষের চাহিদার প্রতি কতটা সজাগ ছিলেন তা 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থটি পাঠ করলে বুঝা যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন, "আমি তাদের বলেছিলাম, প্রথমে সংঘবদ্ধ হোন, তারপর দাবিদাওয়া পেশ করেন, তা নাহলে কর্তৃপক্ষ মানবেনা। তারা একটা ইউনিয়ন করেছিল, একজন ছাত্র তাদের সভাপতি হয়েছিল। আমি আর কিছুই জানতাম না। জেলায় জেলায় ঘুরছিলাম। ঢাকায় এসে যখন শুনলাম, এরা ধর্মঘট করেছে তখন বুঝতে বাকি থাকল না, কর্তৃপক্ষ এদের দাবি মানতে অস্বীকার করেছে। তবু এত তাড়াতাড়ি ধর্মঘটে যাওয়া উচিত হয় নাই। কারণ, এদের কোনো ফান্ড নাই। মাত্র কয়েকদিন হল প্রতিষ্ঠান করেছে। কিন্তু কি করব, এখন আর উপায় নাই।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃঃ ১১২)

আমরা জানি যে স্বল্প বেতনভুক্ত এই কর্মচারীদের আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করে বঙ্গবন্ধু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হয়েছিলেন ১৯৪৯ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে। তিনি অন্যায়ের সাথে কোনো অপোস করবেন না বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিত মুচলেকা ও জরিমানা দিয়ে ছাত্রত্ব ফিরিয়ে নেননি কিংবা নিজ স্বার্থে আন্দোলনের মাধ্যমে বহিস্কারাদেশ প্রত্যাহারের চেষ্টাও করেননি। এই ছিলেন বঙ্গবন্ধু। পরার্থে নিবেদিত এক প্রাণ যিনি মানুষের জন্য ছাত্রত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করতে জানেন। ইতিহাসের কি অদ্ভুত মিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন বেতনের কর্মচারীদের দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য যিনি ১৯৪৯ সালের ২৬ শে মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিদ্ধান্তের ফলে ছাত্রত্ব হারিয়েছিলেন, দীর্ঘ ২৪ বৎসর বাঙালির মুক্তির জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে ১৯৭১ সালের আর এক ২৬ শে মার্চে তিনিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

কর্মচারী ইউনিয়নের 'ফান্ড নাই' বলে বঙ্গবন্ধু যা বললেন তাতে আমরা বুঝি তিনি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা দরকার, ধর্মঘটের সময় কর্মচারীদের সংসার পরিচালনার জন্য যে ন্যূনতম টাকার প্রয়োজন তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। কর্মচারী ইউনিয়নের ফান্ডের চিন্তা বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনার প্রাগ্রসরতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রখ্যাত মার্কিন প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেন, "If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all". বঙ্গবন্ধু তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে লিখছেন, "জিন্নাহ চলে যাওয়ার কয়েকদিন পর ফজলুল হক হলের সামনে এক জনসভা হয়। তাতে একজন ছাত্র বক্তৃতা করেছিল, তার নাম আমার মনে নাই। তবে সে বলেছিল "জিন্নাহ যা বলেছেন তাই আমাদের মানতে হবে। তিনি যখন উর্দুই রাষ্ট্রভাষা বলেছেন তখন উর্দুই হবে।" আমি তার প্রতিবাদ করে বক্তৃতা করেছিলাম। আজও আমার ওই একটা কথা মনে আছে। আমি বলেছিলাম। "কোনো নেতা যদি অন্যায় কাজ করতে বলেন, তার প্রতিবাদ করা এবং তাকে বুঝিয়ে বলার অধিকার জনগণের আছে। যেমন হযরত ওমরকে (রা:) সাধারণ নাগরিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বড় জামা পড়েছিলেন বলে। বাংলা ভাষা শতকরা ছাপ্পান্নজন লোকের মাতৃভাষা, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সংখ্যাগুরুদের দাবি মানতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব। তাতে যাই হোক না কেন, আমরা প্রস্তুত আছি।" (অসমাপ্ত আত্মজীবনী পৃ : ১০০)। বঙ্গবন্ধুর জীবনের এসব স্মৃতি আমাদের আত্মবিকাশের পথের নিশানা।

বাঙালি জাতিকে স্বল্প সময়ে বঙ্গবন্ধু যে কথাগুলো বলে গেছেন তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করা আমাদের দায়িত্ব। ১৯৭২ সালের ৩০ শে মার্চ চট্টগ্রামে বুদ্ধিজীবী সমাবেশে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "এতদিন পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হইতে মানুষ সৃষ্টি হয় নাই, এক ধরনের আমলাই কেবল সৃষ্টি হইয়াছে।" জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলোকবর্তিকা পৌছাইয়া দেওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বঙ্গবন্ধু বলেন, "পল্লির জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করার জন্য আমাদের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়া অতিবাহিত করা উচিত।" নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ছাত্র রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করার জন্য বঙ্গবন্ধু শিক্ষক সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না, আমি নিজে সুদীর্ঘকাল আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ পার হইয়া আসিয়াছি বলিয়াই এমনভাবে কথা না বলিয়া পারিতেছিনা।" (ইত্তেফাক, ৩১ মার্চ, ১৯৭২)

আমাদের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা জীবন দিয়ে গেছেন, যাঁরা সম্ভ্রম হারিয়েছেন, তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নেওয়ার কথা বঙ্গবন্ধু বারবার বলে গেছেন কারণ তাঁরা তাঁদের বর্তমানকে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করেছেন। ১৯৭২ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি নগরবাড়িতে এক জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে, পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর হাতে নির্যাতিতা মহিলাদের গৃহিনীর মর্যাদা প্রদান করে আমাদের মহত্ত্বের ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু বলেন, এ সব নির্যাতিতা মহিলাদের একমাত্র দোষ ছিল তাঁরা বাঙালি এবং তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমিকে গভীরভাবে ভালোবাসে। বঙ্গবন্ধুর এ সকল নির্যাতিতা মহিলাদের মাঝ থেকে স্ত্রী পেতে ইচ্ছুক যুবকদের নামের তালিকা প্রস্তুতের আবেদন জানান। (সংবাদ, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)

শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে মার্কিন শিক্ষা বিভাগের বক্তব্য- "The purpose of education is to promote student achievement and preparation for global competitiveness by fostering education excellence and ensuring equal access."

বঙ্গবন্ধু শিক্ষাকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও নীতিনৈতিকতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার দিন অর্থাৎ ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭২ তারিখে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আইনের চোখে সাড়ে সাত কোটি মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই চারটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচিত হয়েছে। সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতির মাঝে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক, সর্বজনীন ও একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ও তৃতীয় ভাগে নাগরিকদের ২২টি ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।"

বঙ্গবন্ধুর জীবন থেকে শিক্ষা গ্রহণের অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। কেউ কি চিন্তা করতে পারবেন যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৮ই মে বগুড়া ভ্রমণে গিয়ে বগুড়া মহিলা কলেজের ছাত্রী আখতারকে সংজ্ঞাহীন দেখে তিনি তাঁকে সার্কিট হাউসে নিয়ে চিকিৎসক ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন ও মেয়েটি সুস্থ হয়ে বাড়ী না যাওয়া পর্যন্ত তিনি সকল অফিসিয়াল কার্যক্রম বন্ধ রাখেন। (অধুনালুপ্ত দৈনিক বাংলা, ৯ মে, ১৯৭২)

কেউ কি ভাবতে পারেন যে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বৃদ্ধ কৃষক কুলমান সিং-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি তাকে বাংলাদেশ থেকে ঔষধ পাঠিয়েছিলেন। (অধুনালুপ্ত বাংলার বাণী, ২ জুন ১৯৭২)

সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে বঙ্গবন্ধুর আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ উপরের দু'টি ঘটনায় বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া গেলনা। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর জীবনের এমন অগণিত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যা শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে তা নবীন প্রজন্মকে সহনশীল, উদার, সমব্যাথি, নিষ্ঠাবান ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করবে।

গত বৎসর (২০২৩) আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবসের মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'To invest in people, prioritise education' যা বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালের ২৮ শে অক্টোবর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার-টেলিভিশনে ১৯৭০-এর নির্বাচনের প্রক্কালে বলেছিলেন যে 'শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর হতে পারেনা' যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৩রা ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিবৎসর ২৪ শে জানুয়ারি আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস পালিত হয়ে আসছে। জাতিসংঘের ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এসডিজি অর্জনের যে ১৭টি ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়েছে সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে শিক্ষাকে অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের চার নম্বর এজেন্ডায় বলা হয়েছে 'ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning oppourtunities for all by 2030. এ প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর একটি উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে– 'Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever'. বঙ্গবন্ধুর উপদেশ ও পরামর্শে ডঃ কুদরাত ই-খুদা শিক্ষা কমিশনও এই জীবনব্যাপী শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনে বঙ্গবন্ধু এসেছিলেন ১৯৭৪ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে সপ্তাহব্যাপী জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উদ্বোধনের জন্য। সেদিন তিনি উদ্বোধনী ভাষণের শেষাংশে এসে সুধী-মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেন, "একটি সুষ্ঠু জাতি গঠনে শিল্প, কৃষি, যোগাযোগব্যবস্থা বা অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে যেমন উন্নয়ন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন চিন্তা ও চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করা। আমি সর্বদাই একটি কথা বলি- সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই। সোনার মানুষ আকাশ থেকে পড়বে না, মাটি থেকেও গজাবে না। এই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের মধ্য থেকে তাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে। নবতর চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধের মাধ্যমেই সেই নতুন মানুষ সৃষ্টি সম্ভব। মানবাত্মার সুদক্ষ প্রকৌশলী দেশের সুধী সাহিত্যিক, শিল্পী, শিক্ষাব্রতী, বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবী। আমি আজকের এ সাহিত্য সম্মেলনে আপনাদেরকে সোনার মানুষ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।" (উত্তরাধিকার, সাহিত্য সম্মেলন সংখ্যা-১৯৭৪, পৃঃ ৭-৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা)

বাঙালি জাতির কল্যাণচিন্তায় নিবিষ্ট বঙ্গবন্ধুর শিক্ষাভাবনার কেন্দ্রে ছিল এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা যা মানুষকে মহৎ করে, সৎ করে গড়ে তোলে, দক্ষ ও যোগ্য সুনাগরিক নির্মাণ করে, দেশপ্রেমিক সত্তার উদ্ভব ঘটায়, দিগন্তপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে, মনোজাগতিক চৈতন্য বিকাশ লাভ করে ও সর্বোপরি সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ মানুষে রূপান্তর করে - গণসচেতন জাতি সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন, 'No legacy is so rich as honesty' (শেক্সপিয়ার)। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ রচিত পঙক্তি 'সত্য সত্য সত্য জপি/ সকল বুদ্ধি সত্যে সঁপি' ও 'শুচি করি মন' পঙক্তিত্রয় আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দিতে পারে যা শিক্ষার পথে হবে আলোর দিশারি।

মহান স্বাধীনতা বার্ষিকীর এই দিনে, আসুন, আমরা নিজেদেরকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার মানুষে রূপান্তর করি। ❑

লেখক : প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়